Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.57-65
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের দৃষ্টিতে নারী

রিঙ্কা দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়,গুয়াহাটি, আসাম, ভারত

Abstract:
The purpose of this research paper is to analyse the characterization of the main characters of the Trilogy of Gajendra Kumar Mitra. The Trilogy (Kolkatar Kachei, Upakanthe, and Poush Faguner Pala) of Gajendra Kumar Mitra is an exceptional addition to the post independence modern Bengali literature. The three parts of this novel explains the stories and characters which are more realistic and practical with an excellent outword appearance. The women characters drag more attention especially in these novels. This paper explores the struggle of women who have to adhere to many limitations in their life. The protagonist of this trilogy Shyama and other women characters are so busy in their life struggles that they do not have enough time for luxury and maintain the relationships with their loved ones. This paper endeavour to portray the three main characters of this novel who transformed themselves through brutal realities of life.
KeyWords: Bengali Novel, Analysis, Women, Reality, Life Struggle.

ভূমিকা: বাংলা কথাসাহিত্যে জগতে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের (১৯০৯-৯৪) আবির্ভাব ঘটে ছোটগল্পকার রূপে (১৯২৮, 'ইজ্জৎ')। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৪১ সালে তাঁর 'মনে ছিল আশা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশিকাল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, কিশোরসাহিত্য প্রভৃতি তাঁর লেখনীর সৃষ্টিতে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সামাজিক , ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিপুল সাহিত্যসম্ভার। সাহিত্যিক হওয়ার পাশাপাশি গজেন্দ্রকুমার ছিলেন প্রকাশক ,বাল্যবন্ধু সুমথনাথের সঙ্গে গড়ে তোলা 'মিত্র ও ঘোষ' (১৯৩৪) গ্রন্থ প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের। তাছাড়া 'কথাসাহিত্য'(১৯৪৯) নামের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদকও ছিলেন তিনি , যে পত্রিকা আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রকাশিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা ৩২টি। তাঁর ত্রয়ী (ট্রিলজি) অর্থাৎ 'কলকাতার কাছেই' (১৯৫৭), 'উপকণ্ঠে'(১৯৬০) এবং 'পৌষ ফাগুনের পালা'(১৯৬৪) স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যসাধানার জন্য গজেন্দ্রকুমার তাঁর জীবনে বিভিন্ন সম্মান ও সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৫৯ সালে অকাদেমি পুরস্কার ও 'পৌষ ফাগুনের পালা'-র জন্য ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের এক নয়,তিন প্রজন্মের কাহিনি স্থান

পেয়েছে ত্রয়ী উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসে যে বাঙালি জীবন উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে কোনো অসাধারণ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। উপন্যাসে মানুষ যখন 'চরিত্রে' পরিণত হয় তখন সে চরিত্র সাধারণ হয়েও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। উপান্যাসত্রয়ে যে সব ঘটনা সমাবেশে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেসব ঘটনাও চমকপ্রদ নয়। উপন্যাসের ঘটনাগুলোও একঘেয়ে এবং নিস্তরঙ্গ। ঔপন্যাসিকের বাস্তবতার প্রতি এতো প্রবল আগ্রহ যে তিনি সাধারণ ঘটনাবিন্যাসে প্রয়াসী এবং চরিত্রগুলোর সুখদুঃখের টানা ইতিবৃত্ত সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ত্রয়ী উপন্যাস যে সকল মানুষদের নিয়ে রচিত তাদের জীবন প্রত্যন্ত গ্রামের শাওলাদামে ভর্তি টোপাপানায় ঢাকা ডোবার মতোই নিস্তরঙ্গ। সেখানে বাইরের বিশ্বের ঝড়ঝাপটা সামান্য স্পন্দন মাত্র জাগাতে পারে না, এমনকি তরঙ্গ তুলতে পারে না। নিজেদের কূপমুণ্ডক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যা তাদের কাছে দেশ-সমাজ-রাস্ট্রের যুগান্তকারী ঘটনার চেয়ে ঢের বড়; লেখক এদের কথাই বলেছেন। একটানা গল্পের সঙ্গে উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় কালচেতনা ও সমাজচেতনা। বিষয় অনুযায়ী উক্ত তিনটি উপন্যাসের নারী চরিত্রের আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে ত্রয়ীর প্রধান চরিত্র শ্যামা- উমা এবং রাসমণি চরিত্রের আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্মের জন্য বর্ণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিষয়ের আলোচনা: তিনটি খণ্ডের বিশাল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামা ঠাকুরুন। শ্যামার টানেই উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রগুলো এসেছে। ত্রয়ী উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের সমাগমের মধ্যে নারী চরিত্র সংখ্যায় বেশি। ত্রয়ীর তিনটি খণ্ডে তিন প্রজন্মের কাহিনি ব্যক্ত করেছেন গজেন্দ্রকুমার। তিন প্রজন্ম বলতে রাসমনির সংসার, দ্বিতীয় প্রজন্মের তাঁর তিন মেয়ে--- কমলা, শ্যামা, উমা ও তৃতীয় প্রজন্মের শ্যামা ও কমলার সন্তানদের জীবনবৃত্তান্ত এবং নির্মম জীবনযাত্রা সূচিত হয়েছে।

গজেন্দ্র মিত্রের ট্রিলজি যেহেতু নারী প্রধান উপন্যাস তাই এর প্রথম খণ্ড থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী চরিত্রের সমাগম লক্ষণীয়। ঔপন্যসিক তাঁর তুলির স্পর্শে যে নারীদের ছবি এঁকেছেন তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত- নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মা-বোন-জায়া, ভিখারিনী, অনাথা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, আশ্রয়বঞ্চিতা, পুরুষশোষিতা--- যাঁরা আমাদের অভিজ্ঞতার আঙ্গিনায় নিত্যই যাওয়া আসা করেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতা এবং নিরক্ষর দুইই আছেন। তাঁদের দুর্ভাগ্য, দুর্দশা ও দুরাবস্থার অন্তহীন অভিশাপ যেন গজেন্দ্রকুমার গভীরভাবে অনুভব করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীর বিচিত্র রূপ লক্ষণীয়। জননী-জায়া- শ্রেয়সী-প্রেয়সী- কুলটা-সতী-রহস্যময়ী-রঙ্গময়ী কতই না রূপে তাদের পেয়েছি। তেমনি গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসের একটি অন্যতম আকর্ষণ তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্র। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখ্য—

> "তিনি নারী - মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা নন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার' এই জাতীয় বৈপ্লবিক তত্ত্বও প্রচার করেননি। তবু তাঁর উপন্যাসে এমন কিছু চরিত্রের দেখা মেলে যারা নিরক্ষরতা অথবা স্বল্পবিদ্যা সম্বল করেও জীবনযুদ্ধে হার মানে না, যাদের লাঞ্ছনা বা সামাজিক অসম্মান তাদের অন্তর্নিহিত নারীত্বকে নিষ্প্রভ করতে পারে না; "[১]

ত্রয়ী উপন্যাসের নারী চরিত্রাঙ্কনের প্রেরণাস্থলকে চিহ্নিত করতে ঔপন্যাসিকের ভাষায় বলা যায় –

> "ছোটবেলায়—খুব ছোটবেলায় মার কাছে থাকতুম। তখন অনেককে দেখেছি; নারী বেশি অবশ্য—বালিকা-যুবতী- বৃদ্ধা-সব বয়সের মেয়েদেরই দেখবার সুযোগ ঘটেছে। বহু কাহিনীও কানে গিয়েছে—কোনোটা পুরো, কোনোটা বা টুকরো টুকরোভাবে।"[২]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্যামার জীবনকে কেন্দ্র করে উপান্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে। তথাকথিত হিন্দু পরিবারের জীবননিষ্ঠা এবং নিজ দুর্ভাগ্যের মধ্যে টিঁকে থাকার দুর্জয় সংকল্প দেখা যায় শ্যামার মধ্যে। 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসে শ্যামাকে পাই ছাত্রবৃত্তি পাশ করা দশ বছরের সুন্দরী ও সংযত বালিকা। বিয়ের প্রথম রাতেই স্বামীর দুর্ব্যবহার প্রাপ্তির ও প্রহারের পর ভীতা সন্ত্রস্তা শ্যামার কাছে চোখে জল ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দায়িত্বহীন স্বামী ও ভাসুরের জন্য পূর্বপুরুষের ভিটামাটি হারিয়ে গুপিপাড়ায় চলে আসার পর শাশুড়ি ও জ্যার সঙ্গে উপবাসে থেকে চরম দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়। " ওদের এই দিনে আনন্দ ও আশার দিন হয়ে উঠেছিল পাড়ার নিমন্ত্রণের দিনগুলো "[৩]। পাড়ার ব্রত পার্বণের ব্রাহ্মণের সধবা স্ত্রী হিসেবে দানে পাওয়া গামছা, কাপড়, সিঁন্দুর, আলতা, দক্ষিণা, মিষ্টি, পান সুপারি যেন রীতিমতো রোজগারের উপায় হয়ে পড়ে শ্যামার কাছে। "উপার্জন করার যে কী আনন্দ, সে শ্যামা প্রথম পায় ওইভাবেই,।"[৪] সঞ্চয় যে জীবনের কতটা জরুরি এর থেকেই শিক্ষা নেয় শ্যামা আর তখন থেকে শুরু হয় তার উঞ্ছবৃত্তির পালা।

শ্যামার স্বামী নরেন পদ্মপুকুর গ্রামে সরকারবাড়িতে নিত্য ঠাকুর সেবার কাজ পেয়ে কলকাতা থেকে স্ত্রী ও পুত্র হেমকে নিয়ে আসে । কিন্তু নরেন তার স্বভাববশত সেখানে কিছুদিন থেকে কাউকে না জানিয়ে চলে যায়। নতুন পরিবেশে এই অবস্থায় অসহায় শ্যামা স্বামীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে নিজ 'বরাত'-র ফল জেনে অভাব-অনটনকে মেনে নেয়।এইভাবে দিনের পর দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াইয়ে শ্যামার কোমলবৃত্তিগুলি যেন হ্রাস পায়; শ্যামা হয়ে ওঠে ক্রমে নীচ স্বার্থপর ও লোলুপ। সরকারবাড়ির বাগানের ফল পাকুড়, শাক-সজি চুরি করে ছেলে হেমকে দিয়ে বাজারে বিক্রি করানোর মতো উপার্জন করে শ্যামা দিনের পর দিন অতিবাহিত করে। চুরি ধরা পড়লে পর শ্যামাকে সরকার কর্তা ও গিন্নি দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়েছে অনেকবার ঠিকই , সংসারের আর্থিক দৈন তাকে আবারও চুরি করতে বাধ্য করেছে।

> "মানবিক অমর্যাদার অবমাননা কতদূর হতে পারে সে ছবি দেখে দুহাতে চোখ ঢাকতে হয়। মানুষের লজ্জা-সম্ভ্রম- সৌজন্য-ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দিয়ে মানুষ কত ইতর হতে পারে তা জেনে স্তম্ভিত হতে হয়।"[৫]

দীর্ঘদিন থেকে অবিরত অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে একটানা সংগ্রামে শ্যামার মন অনেকটাই পরিবর্তিত হতে থাকে। দায়িত্বহীন স্বামীর সংসারে শ্যামা একাই একের পর এক বহু সন্তানের মাতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতিপালন করেছে এবং তাদের মানুষ করেছে। সরকার গিন্নির সহায়তায় বড় মেয়ে মহাশ্বেতার কোনো রকমে বিবাহের আয়োজন করে শ্যামা। মেয়ের বিয়ের আগের দিন এসে নরেন উল্টো প্রতিবাদ জানায়।নরেনের কাছে কিছু টাকা লুকানো রয়েছে জানতে পেরে শ্যামা সেই টাকা চাইলে সে অম্লানবদনে পুত্রের নামে দিবি খেয়ে অস্বীকৃত হয়। শ্যামা কিছু না বলেই নরেনের কোমর কোঁচার কাপড়টাতে হ্যাঁচকা টান মারতেই চারদিকে রজতমুদ্রা বর্ষিত হয়। নরেনের কাছে যে এতটা টাকা রয়েছে তা শ্যামা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই ক্রোধে দিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শারীরিক সমস্ত বল প্রয়োগ করে নরেনের গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। ঘটনাটি বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। কারণ এর আগে শ্যামার অন্তরের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেনি কখনই । এমনকি তখনও নয় যখন নিদ্রামগ্ন স্ত্রীর পাশে থাকা পুটুলি থেকে রাসমণির দেওয়া

পঞ্চাশ টাকা চুরি করে শ্যামা পালিয়ে যায়---এর পরের দুর্দশার কথা ভেবেও। কিন্তু একমাত্র পুত্রের নামে দিব্যি খেয়ে সেই মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায়- "এতকালের সঞ্চিত চিত্তক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ হয়ে গেল। এ বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত মায়ের সহ্যের বাইরে।"[৬]

অভাবক্লিষ্ট সংসারের গৃহিণী হলেও জামাতা অভয়পদর আগমনে শ্যামা উদাসীন হয়ে থাকেনি, যে সংসারে পেটপুরে খাবার খাওয়া কঠিন, সেখানে আতিথ্য সাজে না। সেক্ষেত্রে শ্যামার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রংশসার দাবি রাখে। সরকার বাড়ির ঠাকুর সেবা থেকে প্রাপ্ত বাসি মিষ্টি দিয়ে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে জামাতার সামনে পরিবেশন শ্যামার রুচিবোধ মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচায়ক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসারিক শ্যামার এই গৃহিণীপণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে শ্যামাকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ফুল্লরার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭] শ্যামা মা রাসমণির মৃত্যুর জন্য কতটা উদ্বিগ্ন বোঝা যায় না, কিন্তু যতটা মার বাসনকোসন ও সোনাদানার প্রতি থাকা তার অদম্য লোভকে প্রকাশিত করে। শ্যামা ছেলে হেমকে পাঠাতে চায় বিকিকিনির হাটে। ছেলে যেতে না চাইলে তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। মা হয়ে ছেলে হেমকে উৎসাহ দেয় চুরি করতে। সুদের কারবারে সূক্ষ্ম হিসাব রচনায় শ্যামার উৎসাহের অন্ত নেই। কুড়ি টাকা মূলধন খাটিয়ে শ্যামা অনেক টাকা জমিয়েছে জীবনের শেষে। বন্ধকী বাসনে তার দুটো থলে বোঝাই করা রয়েছে। শ্যামাকে এক অদ্ভুত চরিত্র রূপে আঙ্কন করেছেন গজেন্দ্রকুমার।

গ্রন্থশেষে দেখতে পাই "না, একাই বেশ আছেন।... ঊনআশি বছর বয়স চলেছে, রোগে ও অনাহারে শীর্ণ শরীর, সামনে ঝুঁকে পড়তে পড়তে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে মুখটা।;;; তবু সেই অবস্থাতেই সারাদিন বাগানে ঘুরে বেড়ান প্রতিনীর মতো।"[৮] শ্যামা তার গোটা জীবনে অবকাশ কাকে বলে জানেন না। "তাছাড়াও আছে অসংখ্য গাছের অসংখ্য শুকনো পাতা... সারাদিনই ঘুরে ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করেন তিনি--- কার জন্য এখনও তাঁর এই কষ্টস্বীকার উঞ্ছবৃত্তি তা তিনি নিজেও জনেন না।"[৯] উঞ্ছবৃত্তি করে শ্যামার যা বর্তমান সঞ্চয় তাতে তাঁর সামান্য রান্না খাওয়ার খরচ চালিয়ে বিশ বছর কাটিয়ে দিতে পারবেন। তিনি নিজেও জানেন এতো বছর বাঁচবেন না। তবু শ্যামা বিরামহীন বিশ্রামহীনভাবে পাতা জমিয়েই চলেছেন।

শ্যামা ও উমা চরিত্রের তুলনা করলে এদের মধ্যে অনেক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। শ্যামা ও উমা যমজ বোন 'একই বৃন্তের দুটি ফুল'। একই সময়ে ফুটে উঠেছিল ওরা, একে অপরের সঙ্গী ছিল বাল্যের দিনগুলিতে। তবে মানসিকতার দিক থেকে উমা চরিত্রটি শ্যামা থেকে উজ্জ্বল। বিয়ের প্রথম রাতে স্বামী শরৎ থেকে প্রাপ্ত নিষ্ঠর অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (মৃত্যু ঘটেছে ' পৌষ ফাগুনের পালা' খণ্ডে) উমা চরিত্রিক উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। বিয়ের দ্বিতীয় দিন থেকেই শাশুড়ির নির্মম অমানসিক অত্যাচার সহ্য করলেও একটি ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিল বর হিসেব শরৎ ভাল লোক, তাঁর ভালবাসা পাওয়াই ছিল উমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু শরতের মুখ থেকে যখন তার অন্য নারীতে আসক্তির কথা এবং মার জুলুমে এই বিয়ে করার কথা শোনে তখন উমা জীবনের সমস্ত অবলম্বন হারিয়ে ফেলে। সে ভেবে পায় না শুধুমাত্র মার (দয়াময়ী) জ্বালাতনে বিয়ে করে একটি নারীর জীবনকে এভাবে নষ্ট করার কী অর্থ থাকতে পারে! সেদিন কিন্তু এই প্রশ্ন উমার মাথায় আসেনি যে, কোন অধিকারে শরত তাকে বিয়ে করেছে। তার নারী জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার কী অধিকার ছিল শরতের! তখনকার দিনে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েরা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতো। উমাও তাই করেছে। কিন্ত বিবাহিতা স্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণে অপারগ স্বামী ও শাশুড়ির

অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও মুখ খোলেনি। শেষে উমার কাছে কলকাতায় পিত্রালয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

এদিকে শ্যামার সংসারের দুঃখের কাহিনি শুনে উমার চোখে জল আসে, তবে সেই অশ্রু সমবেদনার নয়,ঈর্ষার। শ্যামা জীবনে যা পেয়েছে, উমা তা না পাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। দুই বোনের এই মনস্তত্ত্বকে গজেন্দ্রকুমার চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কারো মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনিও যে ঈর্ষার বিষয় হতে পারে, এ নিজে না অনুভব করলে কেউ বিশ্বাস করবে না। উমা শ্যামার দুর্দশার কথা শুনে বলেছে ,"এমনই হয় জীবনে। তোমার কাছে যা দৈন্য তা হয়তো আমার কাছে ঐশ্বর্য। পৃথিবীর সব অভাবই তাই আপেক্ষিক। যে মানুষ বৃহত্তর ছবি দেখে সামনে, সে নিজের বেদনায় সান্ত্বনা পায় সহজেই।"[১০]

কলকাতার নিসঙ্গ জীবনে স্বামী পরিত্যক্তা উমা নিজের স্বল্পবিদ্যা সম্বল করে শেষে কাজ নেয় মেয়ে পড়ানোর। তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী এ কাজও কম দুঃসাধ্যকর ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় মেয়েরা যেমন বাধ্য হয়ে কাজে বেরিয়েছিলেন নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে। ভারতেও এর জোয়ার ওঠেছিল , যার ফলে মেয়েরা সামাজিক ও পারিবারিক বাধার গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা'র নায়িকা আরতি নাচার হয়ে চাকরি করতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এমন অসাধারণ কিছু চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু উমার মন্দভাগ্য তাকে শুধু টিউশ্যানি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি।

> "স্বামী-পরিত্যক্তা উমা একদা অবলম্বন হিসেবে এই মেয়েপড়ানোর কাজ নিয়েছিল--- নিজের স্বল্পবিদ্যা সম্বল ক'রেই। দুটাকা একটাকা মাইনের টিউশ্যানিই বেশী, তাই দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি পড়িয়ে বেড়াতে হয়, নইলে ঘরভাড়া খাওয়া-- একটা লোকের খরচ ওঠে না।"[১১]

উমার বিভ্রান্ত ও পীড়িত মন এমনকি থিয়েটার করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও তা হয়ে ওঠে না। থিয়েটারের মেয়েদের পড়ানো উমাকে দ্বন্দ্বে ফেলে , সেই সময় তার মনে হয়, " নতুন আশা -কাজে ব্যস্ত থাকার আশা,অর্থ উপার্জনের আশা—এমনি নানা আশা এসে বাধা দেয়।সেই আশাই একসময় তাকে থিয়েটারের পদ্ম-ঝির পিছু পিছু অমোঘ, অপ্রতিহিত বলে টেনে নিয়ে যায়। মাথায় ঘোমটা টেনে গায়ে ছাদর মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে কোনোমতে যেন ছুটে পার হয়ে যায় রাস্তাটুকু—তবু মনে হয় পাড়ার হাজার জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে ও বিদ্রুপের হাসি হাসছে।"[১২] গজেন্দ্রকুমার সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন যেখানে জীবন ধারণের তাগিদে মেয়েরা মাথা উঁচু করে চলার সাহসটুকু পেতো না।

গজেন্দ্র-উপন্যাসে চরিত্রের উপর নিয়তির নির্মম প্রহার লক্ষ্য করা যায়। ত্রয়ী উপন্যাসের নারী চরিত্ররা নিয়তির প্রহারকে নিজ বরাত অর্থাৎ অদৃষ্টের ফল মেনে নিয়েছে সহজেই। তৃতীয় খণ্ডে শ্মশানে উমার শব দাহের সময়ের যে দৃশ্য শ্যামার ছেলে হেমের মুখে শোনা যায় তা সত্যি ভয়ঙ্কর "বরাত বটে ছোটমাসীর—মরেও কি শান্তি আছে? শেষ পর্যন্ত পোড়াটাও সুশৃঙ্খলে হ'ল না। পুরো দেহটা পোড়ানই গেল না;;; জানলুম ---ঐ লোকটা আস্তে আস্তে এসে একটা কাঠ দিয়ে মাসীর একটা ঝলসানো পা টেনে বার করে সেই আগ-জ্বলন্ত পা-টা নিয়েই দৌড় দিয়েছে—"[১৩] , 'ওদের বলে অঘোরপন্থী সন্ন্যিসী'[১৪] উপন্যাসে নিয়তির অমোঘ প্রভাব উমা চরিত্রের উপরই বেশি লক্ষ্য করা যায়।" কলকাতার কাছেই" প্রকাশিত হওয়ার পর উমার উপর উপন্যাসের প্রথম থেকে নিয়তির অকারণ নির্মম প্রহার সম্বন্ধে বহু পরিচিত তথা অপরিচিত পাঠক-পাঠিকা

ও বন্ধু লেখককে অনুযোগ করেছেন। রাজশেখর বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন, " উমার একটু ভাল ব্যবস্থা করবেন তো?"[১৫] উমার মন্দভাগ্যের ব্যাপারে গজেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন, " তার যা ভাগ্য এর চেয়ে বেশি কিছু ভাল হওয়া সম্ভব নয়, তার জীবন আরো ব্যর্থ আরও শোচনীয়ভাবেই শেষ হওয়ার কথা।" [১৬] উপন্যাসে ঘটনাক্রমে দেখা যায় উমার পরিণতি এর চেয়ে ভয়াবহ, যার ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক বার বার দিয়েছেন। মা মেয়ের এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সন্ন্যাসী গুরুর কাছে পাঠালে ভণ্ড গুরুর কামনার স্বীকার হওয়ায় উমা নিজেকে এইসব থেকে সরিয়ে আনে। "ভগবান যাকে মারবেন তার আশ্রয় কোথাও নেই"[১৭] গুরুর প্রতি রাসমণির এই উক্তি থেকে লেখক উমার ভাগ্যের পরিহাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। জীবনের এইরূপ পরিস্থিতি মানুষকে অনেক সময় বাধ্য করে আত্মঘাতী হতে কিন্ত " ভাগ্যের এই উপায়হীন প্রতিকারহীন অবিচারের বিরুদ্ধে মনটা মাথা কুটে কুটে একসময় যেন শ্রান্তিতেই ভেঙে পড়ে। মনের সব বেদনা অশ্রুর আকারে ধারায় ধারায় ঝরে পড়ে উপাধান সিক্ত করে। তবু উমার মরা হয় না। জীবনকে ত্যাগ করতে পারে না।"[১৮]

উমার স্বামী শরৎ যে পরের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে একদিনের জন্যও তাকে গ্রহণ করেনি, যা স্বাভিমানী উমার পক্ষে ছিল অসহনীয় অপমান। সেই ব্যক্তি যখন ত্রিশ বছর পর তার দ্বারস্থ হয় তখন উমা তাকে শেষ বয়সে আশ্রয় দিলেও স্বামীর স্থান দিতে পারে না। অনুশোচনায় দগ্ধ শরৎ স্ত্রীর সামান্য প্রয়োজনে লাগাতে পারলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করবে এবং কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করা হবে ভেবে সংসারে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়ালে পূর্ব অপমানের ক্ষোভে উমা একসময় অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠে, " যত দুঃখ পাই না কেন, যত নীচু দোরেই ঢুকতে হোক না কেন—এতে আমার লজ্জার কোনো কারণ নেই। নিজের কাছে নিজের মাথা উঁচু আছে। তোমার ভাতের চেয়ে এ ঢের ভাল। এতকাল যদি তোমার ভাত না খেয়ে কেটে থাকে তো বাকী কটা দিনও কাটবে...মা সতীরাণীর কাছে এই প্রার্থনাই করি অহরহ—অনেক দুঃখ অনেক অপমান জীবনে দিয়েছ---এই অপমানটা আর দিও না। তোমার ভাত যেন খেতে না হয়। তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় অন্তত !"[১৯]

কলকাতার কাছেই উপান্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের ভিড়ে রাসমণি চরিত্রটি রাত্রির আকাশের অসংখ্য নীহারিকার মাঝে উজ্জ্বল তারকাটির মতো স্থির। অতীত জীবনে বৃদ্ধ স্বামীর প্রিয়া ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সতীনপুত্রদের শঠ প্রতারণায় 'কুলত্যাগিণী' অপবাদে তাঁকে স্বামীগৃহ ছাড়তে হয়। স্বামীগৃহ থেকে নিয়ে আসা সামান্য কিছু গয়না ও কিছু বাসনপত্র সম্বল করে তিনি পুরো জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

রাসমণি স্বল্পভাষিণী কিন্তু কঠোর স্পষ্টবাদী এবং প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যবোধে অন্য সকলের থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জনৈক সমালোচক রাসমণি সম্পর্কে বলেছেন,"এই নিষ্প্রাণ স্বার্থকলুষিত তুচ্ছ চরিত্রগুলির পাশে একমাত্র রাসমণিই সুস্থ ও স্বাভাবিক। এই পরিবেশের উর্ধ্বে উঠে তিনি চিত্তের অমলিন তেজ ও ভদ্র পরিবারের ভব্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।"[২০] গজেন্দ্র মিত্রের ত্রয়ী হচ্ছে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গাথা। দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রায় প্রতিটি চরিত্রের উত্থান-পতন দেখা গেছে কিন্তু রাসমণি এক্ষেত্রে নির্বিকার চিত্ত। মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার আঘাত তাদের চাইতে তাঁর বেশি বিঁধেছে। তথাপিও তিনি অনড় ও অবিচল থেকে নিজের কর্তব্য করে গেছেন চিরকাল, পরিস্থিতি যতই প্রবল হোক না কেন, তিনি কোনো কিছুতেই নতি স্বীকার করেননি। সামান্য স্বার্থের তাগিদে কন্যা জামাতা নরেনের ইতরতাকে প্রশ্রয় দেননি। শ্যামার উপর অত্যাচারের কথা জানতে পেরে ' অভি নিকাল যাও' বলে নরেনকে গলাধাক্কা দিতেও তিনি

পিছপা হননি। তাঁর " জীবনের যত বেদনা, যত ব্যাথা—পুঞ্জীভূত গ্লানি, সব ভুলিয়েছিল মা জাহ্নবীর ওই সর্বদুঃখহরা শীতল জল।চোখের গরম জল দিনের পর দিন মা'র ঠাণ্ডা জলে ঝরে পড়ে বুকের তাপ ঠাণ্ডা করেছে... সহ্য করার শক্তি খুঁজে পেয়েছেন,পেয়েছেন আবারো যুদ্ধ করার শক্তি—দুঃখের সঙ্গে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে।"[২১]

রাসমণির নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন ভোরে গঙ্গাস্নানের সময় জলে নামতে গিয়ে এক স্কন্ধকাটা আধপোড়া শব, ঘাটের নীচের সিঁড়িতে তাঁর পা দিতেই ঠেকে। আবছা আলোয় ব্যাপারখানা ঠাহর করে 'নমশিবায়' বলে এক গণ্ডূষ জল ছিটিয়ে দিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে গঙ্গায় নেমে পড়েন।তাঁর সঙ্গে যে কাপড়খানা ছিল সেটা অপবিত্র হয়েছিল বলেও তিনি মনে করেননি। তাঁর কাছে 'শবও যা শিবও তাই।'[২২] প্রাচীন কুসংস্কারাদি থকে যে রাসমণি মুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। বড়দিদির গঙ্গাযাত্রায় রাসমণি একাই সঙ্গী হয়েছিলেন এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে। তিনদিন তিনরাত্রি পর্যন্ত নাভিশ্বাস ওঠা এক গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে একা কাটিয়ে দিয়েছিলেন শ্মশানে। এককালে এই বড়দিদির চক্ষুশূল ছিলেন রাসমণি, অযথা তাঁকে নানান গালমন্দ করেছিলেন। তিনি এমন নিঃস্বার্থভাবে তাকে শেষকালে রক্ষা করেছেন। কর্দমাক্ত পরিবেশে সমস্ত শুচিতা বজায় রেখে ফুটে ওঠা পঙ্কজের মতো চরিত্রটি আকর্ষণীয়।

মানুষের জীবন যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, একটা অদৃশ্য চক্রে সমস্ত জীবন আবর্তিত হতে থাকে,মানুষ তখন তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ও আশা-হতাশার আড়ালে জীবনের এক গভীরতর রূপকে দেখতে পায়। রাসমণির ভিতর দিয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই সত্যকেই ফুটিয়ে তুলেছেন অথবা বলা যায়, রাসমণি তাঁর জীবনে এই বৃহত্তর রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আঘাতের পর আঘাত, হতাশার পর হতাশা এসে তাঁকে জর্জরিত করেছে তবু তিনি আপন বিশ্বাসে অটল হয়ে নির্বিকার থেকেছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিকে উমা ও কমলার জন্য যেমন তাঁর স্নেহ উৎসারিত হয়েছে, তেমনি আবার শ্যামার জন্য নির্বিকার ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। রাসমণির এই দৃষ্টি অব্যবহিতভাবেই শ্যামার স্বার্থপরতা ও নীচতা অনুভব করেছিল। মা হয়ে সন্তানের এই পরিবর্তনকে চোখে দেখেছেন, দেখেছেন কেমন করে এক ব্যক্তির ধীরে ধীরে অধঃপতন হয়। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এর জন্য শ্যামার প্রতি রাসমণির কোনো অভিযোগ নেই ,মেয়ের এই নীচতা দেখে তাঁকে উপন্যাসে কোথাও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় না। তাঁর কাছে এইটাই যেন স্বাভাবিক ধর্ম, যা বাস্তব অথচ সহজ সত্য।

> "রাসমণির এই দৃষ্টির পেছনে সেই মানসিকতা কাজ করেছে যার ফলে এক ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে জীবনের ছোটখাটো স্খলন ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি নিস্পৃহ হতে পারে এবং একথা বলা অসঙ্গত হবে না যদি বলা যায় রাসমণির এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে নিহিত আছে গজেন্দ্রকুমারের বিশিষ্ট জীবনাদর্শ ও মানসিকতা।"[২৩]

উপসংহার: বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রের লেখায় সাধারণ মানুষের জীবন স্থান পেয়েছিল,কেননা, সাহিত্য ক্রমশ ওপরতলা থকে মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছিল। তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এই ক্ষেত্রটি প্রসারিত হতে দেখা যায়। গজেন্দ্রকুমার মিত্রও সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি সেক্ষেত্রে এমন কোনো ইতিহাস বেছে নেননি যাকে অস্বাভাবিক বলা যায়। ত্রয়ী উপন্যাসের নারী চরিত্র যেমন রাসমণি, শ্যামা, উমার জীবনকাহিনি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে , তা আমাদের লোকায়ত জীবনের ইতিবৃত্ত--- যা শরৎসাহিত্যে প্রধান প্রেরণা

হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রেও গজেন্দ্রকুমার ঐতিহ্য আশ্রয় করে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু জীবনের রূপকার হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে , তিনি শরৎচন্দ্রের মতো আবেগময়তাকে স্থান দেননি। শরৎ-উপন্যাসে নায়িকারা আবেগনির্ভর, অকৃতার্থ প্রেমের পাত্রী, অপচিত যৌবনের প্রতিমা। তারা জীবনসংগ্রাম কাকে বলে জানে না। কিন্তু গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ত্রয়ী-উপন্যাসের নারী চরিত্ররা তা জানেন। কী অপরিসীম ধৈর্যে দিনের পর দিন বছরের পর বছর এরা পুরুষশাসিত সমাজের অবিচারের এবং নিয়তির প্রহারের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে গেছেন, তার বিবরণ উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। অন্যদিকে গজেন্দ্রকুমার তারাশঙ্করের মতো কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেও জীবনকে দেখাননি। তিনি শুধু চোখে দেখা জীবনকে রূপ দিয়েছেন। পরিশেষে বলা যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কথাসাহিত্য প্রাত্যহিকতার বাস্তবতায় ঐশ্বর্যবান। তাঁর লেখার সততা দিনের আলোর মতোই সহজ ও স্বচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন ‘সহজ কথা যায় না বলা সহজে’ তেমনি সহজ অথচ কঠিন কথাকে বলে গেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

তথ্য ও সূত্রনির্দেশ:

1. অরুণকুমার বসু, 'কথাশিল্পের নানাদিক', দ্র. 'গজেন্দ্রকুমারঃ সমাজবীক্ষা ও গল্পশিল্পের কারিগর', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশ ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৭১।
2. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'আমার জীবন আমার সাহিত্য', দ্র. সবিতেন্দ্রনাথ রায় ও মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা) 'গজেন্দ্রকুমার মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশ ১৪১৫ বৈশাখ, কলকাতা, পৃ. ৮।
3. গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'কলকাতার কাছেই', দ্র. গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, কলকাতা,পৃ. ২৫৪।
4. তদেব, পৃ. ২৫৫।
5. অরুণকুমার বসু, 'গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ত্রিলেখ', দ্র. গজেন্দ্রকুমার মিত্র মেমোরিয়াল সোসাইটি (সম্পা) 'গজেন্দ্রকুমার মিত্র জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪১৫ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪৭।
6. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'কলকাতার কাছেই', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।
7. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ. ২৪২।
8. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'পৌষ ফাগুনের পালা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯ বৈশাখ, কলকাতা,পৃ. ৪৯৮।
9. তদেব পৃ. ৪।
10. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'কলকাতার কাছেই', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৯০।
11. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'পৌষ ফাগুনের পালা', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ .৪৬।
12. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'কলকাতার কাছেই', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২৭।
13. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'পৌষ ফাগুনের পালা', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০৪।
14. তদেব, পৃ. ২০৫।
15. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'উপকণ্ঠে', দ্র 'ভূমিকা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশ ১৪১৮ আশ্বিন, কলকাতা।
16. তদেব।
17. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'কলকাতার কাছেই', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪৪।
18. তদেব, পৃ. ৩০৭।
19. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'পৌষ ফাগুনের পালা', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৯।
20. গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'কলকাতার কাছেই' পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।
21. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'কলকাতার কাছেই', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮৭।
22. তদেব।
23. গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'কলকাতার কাছেই' পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩।